বন্‌ধের রাজনীতি, মধ্যবিত্ত যুক্তি এবং মিডিয়া মানবিকতা

মানস ঘোষ

বন্‌ধ্‌ ব্যাপারটা আমার কাছে কিঞ্চিৎ অপরিচিত বলে মনে হয়। একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন থাকে প্রতি বছর এতগুলো করে বন্‌ধ্‌ ডাকা হয় তার পরেও অপরিচিত? পাঠক প্রশ্ন করতেই পারেন, আপনি কি মশাই চোখ বুজে থাকেন? সবিনয়ে জানাই 'আজ্ঞে না'। তবে কিনা চোখ খুলে যা দেখতে পাই তা ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। আর এটা করতে গিয়ে মালুম হয় বন্‌ধ্‌ -এর ইতিহাস তেমন পুরানো নয়। বরং যে ইতিহাস আমরা জানি সেখানে 'হরতাল', 'ধর্মঘট' (strike) ও 'বয়কট' অনেক বেশি চেনা।

ধর্মঘট বা স্ট্রাইক শ্রমিকের অস্ত্র। কাজের সময় অনধিক কাজ আট ঘন্টা করার দাবিতে, সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে, ছাঁটাই ও কারখানার অন্যায় নিয়ম চালু করার বিরুদ্ধে শ্রমিকের হাতে একটি বড় অস্ত্র ধর্মঘট। উৎপাদন বন্ধ রেখে আন্দোলন করা। কিন্তু ধর্মঘট তো আর আমজনতার অস্ত্র হতে পারে না। কারণ আমজনতার বড় অংশ হল ছোট ব্যবসায়ী/ চাকুরে মধ্যবিত্ত যারা বেশিরভাগ সময়েই উৎপাদনে সরাসরি যুক্ত নন। অবশ্য চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তও যে কখনো - সখনো তাদের কাজের জায়গায় ধর্মঘট করে আমলাতান্ত্রিক বা অফিস সংক্রান্ত কাজকর্মে রুখে দেন না তা নয়। তবে তার ধর্মঘটের শিক্ষাটা কারখানার শ্রমিকের কাছ থেকেই পাওয়া।

কৃষক -এর সমস্যাটাও কিছুটা একইরকম। সে যেহেতু নিজের উৎপাদন সাধারণত নিজের হাতে করে, যেহেতু সে পুঁজিবাদী শিল্পের উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় তাই তার কাছেও ধর্মঘট বা স্ট্রাইকের বিশেষ কার্যকারিতা নেই। অবশ্যই সে কখনো শ্রমিকের ধর্মঘটে সামিল হতে পারে— এই পর্যন্ত। নিজেই ধর্মঘট আয়োজন করা তার কাজ নয়। কৃষক যেটা করতে পারে তা হল বয়কট; এই বয়কটের আদি রূপটি কিন্তু আসছে কৌম সমাজের নিয়ম - শৃঙ্খলার বাঁধন থেকে। যেমন, প্রাক - আধুনিক কৃষক সমাজের কোনো ব্যক্তি সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করলে সকলে তাকে বয়কট করত। বয়কটের চরিত্রটা কিন্তু কৌম সমাজে প্রাথমিকভাবে ছিল সামাজিক। আমি বলতে চাইছি ধর্মঘট যেমন প্রথম থেকেই সচেতনভাবে যুগপৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক, বয়কট প্রাথমিকভাবে তা ছিল না।

কৃষক সমাজ তথা গ্রামীণ সমাজের প্রতিবাদের এই আঙ্গিকটিকে সর্বজনীন জাতীয় ক্ষেত্রে এনে ফেলার কৃতিত্ব অবশ্যই মোহনদাস গান্ধীর। বয়কট - কে তিনি ব্যবহার করলেন ধর্মঘটের একটি বড় সংস্করণ হিসাবে। একথা বলছি কারণ আমরা আগে বলেছিলাম বয়কটের আদিরূপ উৎপাদন সম্পর্ক তথা অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়, অন্যদিকে ধর্মঘট এই দুটিকেই প্রধানত আক্রমণ করতে চায়। গান্ধীজীর বয়কট কিন্তু ধর্মঘটের মতই। বিলিতি দ্রব্যের উৎপাদন না হলেও বাজার বা মার্কেট - কে আক্রমণের একটি অস্ত্র। অর্থাৎ গান্ধীজীর 'বয়কট' শ্রমিকের ধর্মঘটের 'শ্রমিক - কৃষক - মধ্যবিত্ত সংস্করণ'। আমজনতার অ্যাকটিভিজ্‌ম্‌।

গান্ধীজী বয়কট - কে একটি অর্থনৈতিক আক্রমণের অস্ত্র করে তোলার কৃষক সমাজ কিছুটা সমস্যায় পড়ে গেল। কারণ ইতিমধ্যে ঔপনিবেশিক শাসন স্বনির্ভর গ্রাম এবং বার্টার সিস্টেমকে পরিণত করেছে আধুনিক বাজারে। ফলে গ্রামের মানুষকে তার উৎপাদনের বিনিময়ে বাজার থেকে কিনতে হচ্ছে জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণ। কয়েকটি সস্তায় বিলিতি দ্রব্য কেনা ছাড়া আর তার অন্য উপায় নেই। এখানেই রবীন্দ্রনাথ বয়কটের বিরোধিতা করেন। তাঁর বিরোধিতা যতটা না দার্শনিক তার থেকে অনেক বেশি উপযোগিতাবাদী। কারণ বিদেশি দ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতা কৃষকের কাছে উভয় সঙ্কট হিসাবে দেখা দিয়েছিল। অন্যদিকে গান্ধীজীর বয়কটের ধারণা দার্শনিক এবং রাজনৈতিক। গ্রাম স্বরাজ- এর ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

হরতালের চরিত্রটা আবার সর্বার্থেই সাধারণ এবং সর্বাত্মক। বয়কটের লক্ষ্য যেমন বাজার এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্র, হরতালের চরিত্র জনজীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। হরতালে শ্রমিক তার শ্রম দেওয়া থেকে বিরত থাকবে, কৃষক তার উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রি বন্ধ রাখবে। মধ্যবিত্ত বন্ধ রাখবে অফিস, আদালত। ছাত্র বন্ধ রাখবে স্কুল, কলেজ। গান্ধীজীর হরতালের আর একটা বড় আহ্বান ছিল বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না। অর্থাৎ 'গৃহশ্রম' পর্যন্ত বন্ধ রাখার ডাক দেওয়া হচ্ছে। কারখানার শ্রম, গৃহশ্রম, সামাজিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং অর্থনীতি সবদিক থেকেই 'ঔপনিবেশিক শাসনে উৎপাদন ব্যবস্থা, বাজার, শিক্ষা - এক সর্বাত্মক এবং সেখানে বয়কট, ধর্মঘট সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে। যেখানে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সকলেই মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। সমাজের প্রতিটি স্তর ও পেশার মানুষকে, প্রতিবাদের প্রতিটি আঙ্গিককে একটি সূত্রে গাঁথারপ্রক্রিয়াটি সার্থক হতে পারে 'হরতাল' -এর মাধ্যমে।

ঔপনিবেশিকতা - বিরোধী সংগ্রামে হরতাল সেই অর্থে জনগণতান্ত্রিক জাগরণের একটি মুহূর্ত বলে মনে করা হত। রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে হরতাল ব্যাপক গণ - প্রতিরোধের একটি তুঙ্গ মুহূর্ত বলে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যদি একথা ধরে নিতে হয় যে আজকের বন্‌ধ্‌ আসলে হরতালের একটি উত্তর - ঔপনিবেশিক সংস্করণ, তাহলেও কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন, বলা যায় কৌশলগত দিক থেকেও বন্‌ধ্‌ কখনোই হরতালের সমান কার্যকরী নয়। কারণ হরতাল গণ - আন্দোলন সম্পর্কে ঐকমত্যের প্রকাশ। অন্যদিকে সফল বন্‌ধ্‌ হল যে ইস্যুতে তা ডাকা হয়েছে সে ইস্যুর প্রতি ব্যাপক মানুষের সমর্থনের ইঙ্গিত। (অবশ্যই এক্ষেত্রে আমি ধরে নিচ্ছি একটা আদর্শ অবস্থা যেখানে কেউ কারো উপর জোর করছে না।) হরতাল পালন তাই গণ - প্রতিরোধে 'সক্রিয়' অংশগ্রহণের প্রস্তুতি। বন্‌ধ্‌ পালন করা সে তুলনায় অনেকটাই 'নিষ্ক্রিয়' মতদান। হরতালের মনোভাব ইতিবাচক, অন্যদিকে বন্‌ধর মনোভাব নেতিবাচক।

একথা ঠিক যে অধুনা বন্ধ্-এক বিতর্কিত বিষয়। কেউ বলেন বন্ধ্ ডাকা সঠিক রাজনীতি নয়। এমনকি আদালতও বন্ধ্ -কে অনৈতিক বলেই ঠাহর করেছেন। বলা ভালো বন্ধ্ সেন্টিমেন্ট এখন সর্বত্র। বলা ভালো বন্ধ্ - বিরোধী এই সেন্টিমেন্ট গঠনে বর্তমান গণমাধ্যমের বিরাট ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি। বন্ধ্ - বিরোধী সেন্টিমেন্টে কতটা যুক্তি আছে, কতটা নেই সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। কারণ যুক্তি নির্মাণেরও একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থাকে। যে প্রক্রিয়া আবার শ্রেণি - নিরপেক্ষ এমন দাবি করা অন্যায় হবে। অধুনা যে বন্ধ্ - বিরোধী যুক্তি বেশ প্রবল আকার ধারণ করেছে তা মূলত মধ্যবিত্তের যুক্তি। যুক্তি গুলো রাজনৈতিক নয় বরং বেশ কিছুটা উপযোগিতাবাদী এবং বেশির ভাগটাই moralist বা 'নীতিবাদী'। মধ্যবিত্তের যুক্তির নির্মাণ ও বিকাশ হয় সিভিল সোসাইটির অভ্যন্তরে। কিন্তু এদেশে সিভিল সোসাইটির অস্তিত্ব ততটা প্রখর নয়। আর এই শূন্যতার সুযোগ নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে গণমাধ্যম বা মিডিয়া। পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতাটাই ধরুন না কেন। একটি সংবাদপত্র - গোষ্ঠী তাদের দৈনিক সংবাদপত্র এবং টি. ভি. চ্যানেলের মাধ্যমে বন্ধ্ - বিরোধী যুক্তি নির্মাণ ও লালন করে চলেছে।

একটু লক্ষ করলে দেখবেন এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সংবাদপত্র - গোষ্ঠীটি কিন্তু কেবল বন্ধ্ - এরই বিরোধিতা করে না; ধর্মঘটেরও বিরোধিতা করে। অর্থাৎ প্রশ্নটা যতটা না নীতির তার থেকে অনেক বেশি মতাদর্শগত অবস্থানের। এই সংবাদপত্র - গোষ্ঠীর প্রভাব মধ্যবিত্ত বাঙালীর মধ্যে এতটাই বেশি যে তা আমজনতার মতামত হিসাবে মান্যতা পেয়ে যায়। পাঠক দয়া করে আমাকে বন্ধ্ - এর সমর্থক ভাববেন না। আমি কেবল বলতে চাই— লক্ষ করে দেখুন বন্ধ্ - বিরোধী যুক্তিটি কারা কীভাবে নির্মাণ ও প্রচার করে চলেছেন। বন্ধ্ - বিরোধী/ ধর্মঘট - বিরোধী যুক্তি নির্মাণের প্রক্রিয়াটি আসুন একটু খতিয়ে দেখা যাক। বছর কয়েক আগে মিছিল ও জনসমাবেশে আটকে পড়েছিলেন অমিতাভ লালা নামে জনৈক বিচারপতি। ক্রুদ্ধ বিচারপতি কয়েকজন নেতার নামে সমন জারি করেন। একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল পাল্টা স্লোগান দেয় 'অমিতাভ লালা বাংলা ছেড়ে পালা'। একটি সংবাদপত্র, যা না পড়লে নাকি পিছিয়ে পড়তে হয় এই স্লোগানকে সমালোচনায় ধুয়ে দেয়। ছিঃ ছি, বিচারপতির প্রতি এ কি ব্যবহার! আমার কিন্তু স্লোগানটি সেইদিক থেকে দেখলে যথেষ্ট নান্দনিক এবং মজাদার। (যদিও কোনো ব্যক্তির নামে স্লোগান খুব রুচিসম্মত নয়।) ওই অগ্রগামী সংবাদপত্রে কিন্তু এমনভাবে ব্যাপারটি উপস্থাপনা করা হয় যে স্লোগানের নান্দনিক ও মজার দিকটি সম্পূর্ণ উবে গিয়ে একমুখী নীতিবাগিশ ধারণা তৈরি হয়।

আর একধরনের বন্ধ্ - বিরোধিতা ওই অগ্রগামী সংবাদপত্রে প্রায়শই দেখা যায়, যার আঙ্গিকটিকে সংবাদিকতার ভাষায় বলে 'হিউম্যান স্টোরি'। যেমন, বন্ধ্ - এ চিকিৎসা না পেয়ে ছোট্ট 'মনীষা/ রহিম' -র কষ্ট ইত্যাদি। এটা ঠিকই বন্ধ্ সমর্থকদের উৎশৃঙ্খলা ও নির্মমতা সমালোচনার বিষয়। কিন্তু মিডিয়ায় ওই জাতীয় খবরকে এমনভাবে উপস্থাপনা করা হয় যেন ছোট্ট মনীষা/ রহিমার কষ্টের বেবাক দায় বন্ধ্ নামক কর্মকাণ্ডের। তার আগে বা পরে কিছু নেই! বিরাট পাতা জোড়া খবর হয় এ জাতীয় 'হিউম্যান স্টোরি'র। খবরগুলো মিথ্যা এমন কথাও বলছি না। কেবল একটু বলি যে ওই 'হিউম্যান স্টোরি' - ওয়ালারা যদি তাদের মূল্যবান নিউজপ্রিন্টের সামান্য অংশও আমালাশোলের কয়েকশো ছোট্ট মনীষা/রহিমা-র খাদ্যাভাব বিষয়ে যথা সময়ে ব্যয় করত এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করত তাহলে হয়তো আমলাশোলের ট্র্যাজেডি ঘটত না। কেন করে না তার উত্তর খুবই সহজ— খাদ্যাভাব মধ্যবিত্তের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেয় না, বন্ধ্ দেয়। যুক্তির পিছনে যুক্তিটা এরকমই।

গত কয়েক বছর এরকমই আর একটি যুক্তি গড়ে উঠেছে আই.টি.-কে কেন্দ্র করে। আই. টি. -কে নাকি বন্ধের আওতার বাইরে রাখতে হবে। যেন আই. টি. খাওয়া যায় বা ইনজেক্শনের অ্যাম্পুলে ভরে টীকা হিসাবে শরীরে নেওয়া যায়! স্বাস্থ্য পরিষেবা, হাসপাতাল, দুধের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স এগুলির সঙ্গে বন্ধ্ ছাড় আই.টি.-র ক্ষেত্রেও। যেমন বামফ্রন্ট সরকার তেমনি অগ্রগামী সংবাদপত্র। আই.টি.-র জন্য দুতরফের প্রাণ বড্ড বেশি কাঁদে কিনা! একটু লক্ষ করলে দেখতে পাবেন বন্ধ্ - বিরোধিতার যুক্তিটা এখানে রাজনৈতিক নয়। বরং বক্তব্যটা যেন এরকম যে আই. টি. -র মহৎ, নিরলস সমাজসেবার বিপরীতে বন্ধ্ হল 'সমাজ বিরোধী' কাজ। আজ আর সেই বুদ্ধও নেই সেই সেক্টর ফাইভও নেই। আই. টি. লাটে উঠেছে মন্দার বাজারে। গোটা চারেক বড় কোম্পানি যাদের 'নিরলস সমাজসেবা' ছাড়া নাকি রাজ্যের অর্থনীতি চলছিল না, তারা ফেঁসেছে বিরাট বিরাট সব স্ক্যামে। অথচ রাজ্য সরকার বা অগ্রগামী সংবাদপত্র গোষ্ঠী কারো মুখে রা-টি নেই। 'মহান ' আই.টি.-র কর্মীরা মাইনে পাচ্ছেন না বা গণ - ছাঁটাই হচ্ছেন বলে কিন্তু সানন্দা তিলোত্তমা থেমে নেই। বন্ধ্ -এর কর্মহীনতা বনাম আই.টি.-র মহৎ কর্মযজ্ঞ— এই মিথ-এর সমাপ্তি ঘটেছে।

আমি আর একবার পাঠকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, বন্ধ্ -এর সমর্থন করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয় মোটেই। বরং বন্ধ্ কবলিত মানুষের প্রতি আমার সহানুভূতি কারও চেয়ে কম নয়। কিন্তু বন্ধ্ - বিরোধিতা -কে যেভাবে প্রভাবশালী সংবাদপত্র এবং টি.ভি. চ্যানেল 'মিথ' -এ পরিণত করে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বন্ধ্ বিষয়ে রাজনৈতিক আলোচনা; বন্ধ্ -এর কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা; অকারণ বন্ধ্ ডাকা যে রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছু নয় সে বিষয়ে আলোচনা হোক। রাজনৈতিক যুক্তিতেই বন্ধ্ - এর রাজনীতির বিরোধিতা হোক। মিডিয়ার মিথ এবং মধ্যবিত্তের মিডিয়া মুখাপেক্ষী যুক্তিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করুন।